



ভারতীয় সুন্দরবনে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান বিষয়ক একটি অনুসন্ধান

সুব্রত বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কালিনগর মহাবিদ্যালয়

সারাংশ (Abstract)

গঙ্গা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় নদীবাহিত পলির অবক্ষেপণের ফলে প্রায় ২৫,৫০০ বর্গ কিলোমিটার স্থান ব্যাপি সুন্দরবন অবস্থিত। এই আয়তনের মধ্যে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত প্রায় ৯৬৩০ বর্গ কিমি। যার মধ্যে বনভূমি এবং জলাভূমি নিয়ে অরণ্যের আয়তন প্রায় ৪২০০ বর্গ কিমি। অবশিষ্ট প্রায় ৫৪৩০ বর্গ কিমি কৃষি যোগ্য জমি সহ মানুষের বসবাস উপযোগী। কিন্তু সুন্দরবনের ১০২ টি দ্বীপের ৫৪টি দ্বীপে কেবলমাত্র মানুষের বসবাস। (সুন্দরবনের আয়তন বিষয়ক তথ্যটি সংগৃহীত – “সুন্দরবন মানুষ ও পরিবেশ-অশোক নাথ বসু” পৃঃ ৬)। সুন্দরবন বলতেই আমাদের চিন্তা ও চেতনায় প্রথমেই ‘রয়েল বেঙ্গল টাইগার’ এবং ‘ম্যানগ্রোভ’ অরণ্যের চিত্র ভেসে ওঠে। কিন্তু প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক সম্পদের পাশাপাশি এই দ্বীপগুলিতে গড়ে ওঠা মানবসভ্যতা ও বিশেষ ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে। পুরাতাত্ত্বিক ও ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও সমীক্ষাকালে মাটির গভীরে সুন্দরবনের প্রাচীন বনভূমির এবং বসতির যে সব প্রত্ন চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে তা প্রমাণ করেছে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবনের যা বিস্তার, সে তুলনায় সাবেক সুন্দরবনের আয়তন অনেক বেশী ছিল। বর্তমানে এইসব স্থানের বেশকিছু অঞ্চলে শহরতলি বিকাশ লাভ করেছে। ভারতীয় সুন্দরবন অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যের বিষয়ে আলোচনা কালে অবশ্যই সাবেক সুন্দরবনের বিস্তারিত আলোচনা আসবে। তবে এই আলোচনা খুব সমৃদ্ধ বা তথ্যবহুল উপাদানে পূর্ণ করা সম্ভব নয়। কারণ আজ ও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভাবে কোন স্বীকৃত সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সুন্দরবনে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য বা প্রত্নস্থল নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেনি। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বরে বা স্বল্প পরিসরে কাজ হয়েছে। তাছাড়া প্রাকৃতিক কারণে সুন্দরবনের ভূ-বিন্যাস ও নদীর গতিপথ বারে বারে পরিবর্তিত হওয়ায় অনেক তথ্য নদীর বা সাগরের অগাধ জলরাশির অভ্যন্তরে হারিয়ে গেছে। ফলে বিজ্ঞান বা কালানুক্রমিক সভ্যতার ধারাবাহিক নিদর্শনের স্তর এখানে পাওয়া যায়নি। তবে যতটুকু তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে এটি স্বীকৃত যে এখানে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে। তবে এখানে মূলতঃ সর্বাধিক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল শুষ্ক-কুশাণ-গুপ্ত-পাল ও সেন যুগের সমসাময়িক সময়ে। ভারতীয় সুন্দরবনের উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক কেন্দ্র হিসাবে বলা যায় বর্তমান ডায়মণ্ডহারবার শহরের দেউলপোতা, প্রাচীন স্বরস্বতী নদীতটের আসুরালি ও লালবাটি, বারুইপুরের সীতাকুণ্ড ও আটঘরা এবং বিদ্যাধরীর প্রাচীন তটে অবস্থিত চন্দ্রকেতুগড় ইত্যাদি। **শব্দসূচক (Keywords)** সুন্দরবন, প্রত্নতাত্ত্বিক, মানবসভ্যতা, আবিষ্কার, মৃৎপাত্র, প্রত্নদ্রব্য, বাণিজ্যকেন্দ্র।

ভূমিকা (Introduction)

‘সুন্দরবন’-গাঙ্গেয় ব দ্বীপের এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের বহুস্থানে মানুষের বসতি বিকাশের প্রয়োজনে ভূগর্ভ খনন বা পুকুর খনন কালে ইটের স্তূপ, ভাঙ্গা দুর্গ, মজে যাওয়া বিশাল আকার পুষ্করিণী, তাম্রপট, লিপি, প্রস্তর মূর্তি, দেব দেবীর বিগ্রহ, নিত্য ব্যবহার্য প্রাচীন দ্রব্যাদি প্রভৃতি আবিষ্কার-এই অঞ্চলের প্রত্নসম্পদ ও প্রাচীনত্ব বিষয়ে

কৌতুহল সৃষ্টি করে। যার ফলেই প্রথম দিকে ব্যক্তিগতভাবে এবং পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সুন্দরবনের বিগত সভ্যতা সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের সামগ্রিক আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। ক্রমিক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে একথা আজ স্বীকৃত যে, সুন্দরবনের পশ্চিম অংশেই প্রথম সমৃদ্ধ জনবসতির বিকাশ ঘটে। যার অন্যতম কেন্দ্র ছিল সাগরদ্বীপ। গঙ্গা সাগরের এই সঙ্গম তীর্থ স্থানের উল্লেখ রামায়ণ,

মহাভারত এবং পদ্মপুরাণে আছে। যদিও ভূ তাত্ত্বিকদের মতে তখন সুন্দরবনের নাম ছিল 'শাকদ্বীপ'। শ্রী ধনঞ্জয় দাশ মজুমদার মহাশয় 'বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন-"এই শাকদ্বীপের অস্তিত্ব বহুদিনের এবং এ দ্বীপের কাহিনী বর্ণিত না হইয়াছে এমন হিন্দু ধর্মীয় প্রাচীন গ্রন্থ নাই; ঋগ্বেদে, ব্রহ্মাণ্ড-স্কন্দ ও বিষ্ণু পুরাণে, রামায়ণ ও মহাভারতে ও এই দ্বীপের উল্লেখ আছে।" (শ্রীখণ্ড সুন্দরবন - সম্পাদনা দেবপ্রসাদ জানা, প্রবন্ধ- সুন্দরবনঃ উৎসে ফেরা-কমল চৌধুরী পৃঃ১৭)। আবার পরবর্তী কালীন বিভিন্ন লেখকের বিবরণ, যেমন - 'পেরিপ্লাস অফ দ্য ইরিথ্রিয়ান সী' নামক গ্রন্থে, টলেমির বিবরণে, মেগাস্থিনিসের বিবরণে গঙ্গারিডি জাতি ও রাজ্যের কথা উল্লেখ আছে এবং পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ - এর সমতট অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক বিবরণ প্রভৃতি। তাছাড়া সুন্দরবনে প্রাপ্ত বিভিন্ন তাম্র ফলকের বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং প্রত্ন দ্রব্যের বিশ্লেষণে প্রতিষ্ঠিত যে, কমপক্ষে প্রত্নযুগের শেষপর্ব থেকে সাবেক সুন্দরবন অঞ্চলে মানুষের গমনাগমন ঘটেছিল এবং প্রাক খ্রীষ্টীয় সময়কালের অন্তিম শতাব্দী গুলিতে নগরায়ণ প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটে। এরপর খ্রীষ্টীয় বর্ষের সূচনা থেকে আনুমানিক দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এ অঞ্চলে জনবসতির সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে সংস্কৃতির উত্তরণ অব্যাহত থাকে। তাই ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রির গুরুত্ব কোন অর্থে কম নয়। এখন আমরা এখানে প্রাপ্ত প্রত্ন সামগ্রী, তার সময়কাল এবং প্রাপ্তি স্থান প্রভৃতির বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক সময়কালের সভ্যতা, তার প্রাসঙ্গিকতা এবং প্রত্ন ভাণ্ডার হিসাবে সুন্দরবনের গুরুত্ব অনুধাবন ও অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবো।

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক নথি পত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আধুনিক গবেষকদের রচিত নানাবিধ তথ্যসমৃদ্ধ রচনাবলী উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনাকালে অতি অবশ্যই গবেষণা ক্ষেত্রে অনুসরণ যোগ্য পর্যালোচনামূলক এবং তথ্যনিষ্ঠ অনুসন্ধান রীতিকে অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণার গুণগত মান রক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of the Research)

- সুন্দরবনে গড়ে ওঠা মানবসভ্যতার প্রাচীনত্বকে অনুধাবন করা।
- প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও মানবসভ্যতা কতটা উন্নতরূপে বিকশিত হয় তা অনুধাবন করা।
- সুন্দরবন দ্বীপে আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রত্নসামগ্রী এবং তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে মূল্যায়ন ভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করা।
- কোন সময়কাল বা রাজত্বকালের প্রভাব প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রীতে প্রতিফলিত তা অনুসন্ধান করা।
- প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা জয় করে কোন কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সুন্দরবনের যোগাযোগ গড়ে ওঠে তা জানা।
- প্রত্নদ্রব্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধিবাসীদের ধর্মীয় ভাবনা এবং সামাজিক জীবন সম্পর্কে জানা।
- সুন্দরবন কেন্দ্রিক ইতিহাস চর্চার সুযোগ সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং বিষয়টি যাহাতে ভবিষ্যতে আরো বেশীকরে গবেষণার ক্ষেত্ররূপে গবেষকদের কাছে

আকৃষ্ট হতে পারে, তার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ(Interpretation and Analysis)

সুন্দরবন অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার সূচনা ব্যক্তিগত উদ্যোগে। এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক মজিলপুরের জমিদার কালিদাস দত্ত মহাশয়। তিনিই সুন্দরবনের লুপ্ত সভ্যতার প্রথম আবিষ্কারক। ১৯৩০-এর দশকে তিনি সুন্দরবনের দুর্গম ও বিপদ বহুল অরণ্যে প্রাচীন জনবসতির নিদর্শন অনুসন্ধানে ব্রতী হন। পশ্চিম সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থান তল্লাশি করে তিনি বহু প্রত্নক্ষেত্র, প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ, অসংখ্য মূল্যবান এবং বিস্ময়কর প্রত্নদ্রব্য আবিষ্কার এবং সেগুলির প্রাসঙ্গিক ও গ্রহণযোগ্য ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করে সমসাময়িক বিভিন্ন গবেষণাধর্মী পত্র-পত্রীকায় প্রকাশ করেন। কালিদাস বাবুর নিরলস প্রচেষ্টা, প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী এবং আবিষ্কৃত প্রত্নদ্রব্য বিষয়ে আকৃষ্ট ও উৎসাহিত হয়ে বহু গুনিজন একাজে ব্রতী হন। তিনি সুন্দরবনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক মানচিত্র ও ১৯৩০ সালে প্রকাশ করেন। বিশিষ্ট সে সব ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রমাপ্রসাদ চন্দ, নীহার রঞ্জন রায়, গৌরিনাথ শাস্ত্রী, নলিনী কান্ত ভট্টশালী, কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, স্টেলা ক্রামরিশ, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, গুরুসদয় দত্ত, কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। পরবর্তীকালে বহু গবেষক একাজে ব্রতী হয়েছেন।

সুন্দরবন অঞ্চলের প্রত্নদ্রব্য বিষয়ক আলোচনা আমরা নদী অববাহিকার জনবসতি কেন্দ্রীক অনুসরণ করে করতে পারি। এভাবে আলোচনার শুরুতেই আসবে প্রাচীন সরস্বতী নদীর এবং বর্তমান হুগলী নদীর তীরবর্তী সাবেক সুন্দরবন অঞ্চল। এই অঞ্চলের প্রধান প্রত্নস্থল গুলি হল-

দেউলপোতা, আসুরালি, লালবাটী, হরিনারায়ণপুর প্রভৃতি। বর্তমান ডায়মণ্ডহারবার শহরের পশ্চিমে অবস্থিত দেউলপোতাতে প্রাচীন টিবি আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে মধ্যপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর যুগের পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। যার মধ্যে আছে হাতকুঠার, ফলকায়ুধ, ছেদক, মুষক ছিদ্রকারী ফলক প্রভৃতি। অস্থি নির্মিত আয়ুধের মধ্যে আছে মৎস্য কশেরুকাখণ্ড নির্মিত কবচ, পশুর পিঞ্জরাস্থি দিয়ে তৈরি কবচ, তরবারির আকৃতি ফলক, ক্ষুদ্র অস্থির বাটালি ও পশু শৃঙ্গ নির্মিত কয়েকটি হাতিয়ার। তাম্রযুগের নিদর্শন হিসাবে পাওয়া গেছে একটি মাস্তুল বিশিষ্ট অক্ষিগোলক জাতীয় প্রতীক চিহ্ন যুক্ত ক্ষুদ্র সমুদ্র যানের প্রতিকৃতি, তাম্র ফলকে মিলেছে অলঙ্কার ভূষিতা নগ্ন নারী মূর্তি, যুগ্ম কবচ, এছাড়া বাটালির অংশ ও পাত্রের স্কন্দ বেড়া। এখানে মিলেছে মধ্যপ্রাচ্যের লিডিয়াম স্বর্ণমুদ্রা, মিশরীয় স্কারার মাদুলি বা চার্ম- এগুলি প্রমাণ করে যে এই সভ্যতার সঙ্গে বহিঃদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মৃৎপাত্রের মধ্যে মিলেছে বিচিত্র কলস, কোশীপাত্র, ভৃঙ্গার, উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণের কৌলাল, সম রেখাঙ্কিত পাত্র ইত্যাদি। প্রাচীন যুগের মৃত্তিকা মূর্তির মধ্যে আছে অনন্তস্বরূপা জটাজুট ধারিণী মাতৃকা মূর্তি, বিচিত্র গঠনযুক্ত ক্ষুদ্রকায় পশু ও মনুষ্য মূর্তি।

মধ্যযুগের অসংখ্য নিদর্শন ও দেউলপোতায় আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন- বিভিন্ন শৈলীর টেরাকোটার মৃত্তিকা মূর্তি। যার মধ্যে আছে যক্ষ-যক্ষিণী, সূর্য, অগ্নি, কুবের, ইন্দ্র প্রভৃতি দেব-দেবতা এবং মেষ, হস্তি, বৃষ প্রভৃতি পশুর খেলনা মূর্তি। এছাড়া এখানে বেশ কয়েকটি লেখ যুক্ত সীলমোহর, রূপা ও তামার ঢালাই মুদ্রা, লেখ যুক্ত দেবী পার্বতীর একটি ধাতু মূর্তি পাওয়া গেছে। যা সবই শুঙ্গ-কুষাণ-গুপ্ত এবং পরবর্তী কালের।

আসুরালিতে আবিষ্কৃত হয়েছে বিশাল বিষ্ণু মূর্তির এবং সরস্বতী মূর্তির অংশ। পাড়দহ ও মুড়াগাছা গ্রামে মিলেছে পুরাতন পাটেশ্বরী মন্দির, যে মন্দিরে আনুমানিক একাদশ শতকের নীলাভ ব্যাসাল্ট পাথরে খোদিত একটি সূর্য মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। লালবাটী প্রত্নক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি প্রাচীন বিশাল জলাশয়, যা সংস্কার কালে মিলেছে আনুমানিক অষ্টম বা নবম শতকের কালোপাথরের তৈরী অষ্টভূজা এক বিশাল মহিষমর্দিনী মূর্তি। প্রত্ন স্থল হরিনারায়ণপুর সম্পর্কে গবেষকরা বলেছেন অতীতে অবশ্যই এই অঞ্চলের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্য চলত। এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে অসংখ্য নারী মূর্তি পুতুল, যে মূর্তির সবগুলি প্রায় কণ্ঠহার, অঙ্গুষ্ঠি, কঙ্কন, বাজু বন্ধ এবং কবচ পরিহিত। তাদের দেহ সৌষ্টব ও অতুলনীয়। শুষ্ক-কুষ্ণাণ যুগের বৈশিষ্ট্যযুক্ত হস্তি, অশ্ব, মেঘ এবং গণপতি, অগ্নিদেবতা ও নানা ভঙ্গিমায় মিথুনরত মানুষ ও পশুর মূর্তি, যক্ষ-যক্ষিণী মূর্তি, জাতক ও নীতি কাহিনীর নানা ফলক। এখানে যে সীলমোহর মিলেছে তার একটিতে গাড় রক্তবর্ণ টেরাকোটা সীলমোহরে নারী ও পুরুষ মুখোমুখী দণ্ডায়মান। একটিতে অর্ধ চন্দ্রাকৃতি শিরোভূষণ যুক্ত পুরুষ মূর্তি প্রাচীন মিশরীয় ভঙ্গিমায় বামপদ অগ্রসর করে দণ্ডায়মান। তার দক্ষিণ হস্তে ধৃত দণ্ডটির অগ্রভাগ কর্কটবাহু আকৃতির। অন্যদুটি সীলমোহরে উৎকীর্ণ ধনুর্ধর যুগ্ম মৃগচিত্র ও পরস্পর দুটি বৃত্ত চিহ্ন ছেদী রেখাযুক্ত-যা প্রাগৈতিহাসিক মধ্যপ্রাচ্যের শিল্পরীতির প্রভাব বহন করে। এছাড়া এখানে অসংখ্য রৌপ্য, তাম্র ও সামান্য সংখ্যক অক্ষচিহ্নযুক্ত স্বর্ণ ও ঢালাই মুদ্রা প্রাপ্তি সুপ্রাচীন মুদ্রা ব্যবস্থার কথা মনে করায়। মুদ্রায় চিহ্ন দেখা গেছে দ্রুম, চৈত্য, মৎস, চন্দ্র, হস্তি, তুলাযন্ত্র, নৌযান, চক্র, উঠ প্রভৃতি। কিছু ব্রাহ্মী লিপি আছে যা, খ্রীঃপূঃ ২য়, ৩য় ও ৪তুর্

শতকের বৈশিষ্ট্য যুক্ত। যে কারণে গবেষকরা বলেছেন এটি অবশ্যই সে সময়ের অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল।

সুন্দরবনের আদিগঙ্গার অববাহিকায় ও অনেক প্রত্নস্থল এবং প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। গবেষকরা বলেছেন, এখানে অতীতে সমৃদ্ধ জনবসতি গড়ে উঠেছিল। ১৯৫২-৫৪ সালে আশুতোষ সংগ্রহশালা কতপক্ষ বোড়ালে উৎখনন করে বিশাল সেনদিঘী, মাটির গভীরে প্রাচীন দেবালয়ের ধবসাবশেষ, অসংখ্য প্রাচীন টেরাকোটা মূর্তি পুতুল, ফলক, প্রস্তর ভাস্কর্য নিদর্শন, সীলমোহর আবিষ্কার করে। বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষকরা বলেছেন স্থানটি দ্বিতীয় শতক থেকে প্রায় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত অন্যতম জনবহুল ধর্মকেন্দ্রীক স্থান ছিল। বোড়ালের নিকটবর্তী ফরতাবাদ-মহামায়াপুর একদা বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনস্থল ছিল। এখানে প্রাপ্ত পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের বৌদ্ধ তারামূর্তি, ব্রোঞ্জের মহাপ্রতিসরা মূর্তি ও বুদ্ধ মূর্তি সে দিকেই ইঙ্গিত করছে। ডিঙ্গলপোতায় আবিষ্কৃত হয়েছে বিশাল টিবি, প্রাচীন মন্দিরের অংশ, প্রাচীন জলাশয় এবং কালো পাথরের বেশকিছু আনুমানিক দশম-একাদশ শতকের বিষ্ণু মূর্তি। গোবিন্দপুরে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন রাজবাড়ী, অলংকৃত ইট এবং তাম্রপট্ট লেখ। এখানে প্রাপ্ত- "লক্ষণসেনের তাম্রশাসন লেখ থেকে জানা যায়, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী আলিপুর, খিদিরপুর, বেহালা, ফলতা, ডায়মণ্ডহারবার, কুলপী এবং ভাগীরথীর পূর্ব তীরবর্তী অঞ্চল ছিল খাড়ি মণ্ডলের অন্তর্গত।" (শ্রীখণ্ড সুন্দরবন -সম্পাদনা দেবপ্রসাদ জানা, প্রবন্ধ- সুন্দরবনঃ উৎসে ফেরা-কমল চৌধুরী পৃঃ২৩)।

প্রত্নক্ষেত্র রূপে বারুইপুরের নিকট সীতাকুণ্ড-আটঘরা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। গবেষক নির্মলেন্দু

মুখোপাধ্যায় লিখেছেন-“এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীর বেষ্টিত প্রাচীন নগর, গড়ানো টিবিমালা, প্রাচীন জলাশয়, অসংখ্য সীলমোহর, নানা ধরনের প্রাচীন মুদ্রা, মৃৎপাত্র, টেরাকোটা পুতুল, মূর্তি পুতুল ও ফলক, নানা বর্ণের ও গঠনের পাথরের পুঁথি, পাথরের বিগ্রহ ইত্যাদি। তিনি আরো বলেছেন প্রত্ন স্থানটি পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে বেদচর্চার কেন্দ্র ছিল তা প্রমাণ হয়েছে একটি লাল পাথরের সীলমোহরের ছাঁচের লেখ থেকে। এছাড়া ও এখানে প্রস্তরের বিষ্ণু, সূর্য, সরস্বতী এবং বুদ্ধ মূর্তি পাওয়া গেছে। এখানে প্রাপ্ত রূপা ও তামার মুদ্রা, শবাধার পাত্র সম্পর্কে পুরাতাত্ত্বিকদের প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে।”(কোরক, সাহিত্য পত্রিকা, সুন্দরবন সংখ্যা; প্রবন্ধ সুন্দরবনের প্রত্ন সম্পদ- নির্মালেন্দু মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১৫৪)।

কল্যানপুর ও সরবেড়িয়াতে খননকার্যে দুটি প্রস্তর নির্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই মন্দির ও মূর্তি নির্মাণে নাগর শৈলী লক্ষ্য করা গেছে। সরিষাদহ, কাশীপুর, দক্ষিণ বারাসাত বর্তমানে জনবহুল শহর, তবে এখানেও আবিষ্কৃত হয়েছিল প্রাচীন অনেক নিদর্শন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- পাথরের নিত্যরত বিষ্ণুমূর্তি, নৃসিংহ অবতার মূর্তি, সূর্যমূর্তি প্রভৃতি। মহেশপুরে আবিষ্কৃত হয়েছে পাথরের অষ্টভূজা দুর্গা, বিষ্ণু মূর্তি, প্রস্তর নির্মিত একটি অলংকৃত দ্বারবাজু। বন সুন্দরিয়া থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রাচীন টেরাকোটা ফলকে শিব মন্দির ও বিশাল শিব লিঙ্গ, শাহজাদপুর থেকে মিলেছে মনিরাজার টিবি ও তাঁর রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, বৌদ্ধ ও জৈন দেব মূর্তি এবং কয়েকটি বিষ্ণুপট। কৃষ্ণচন্দ্রপুর থেকে একটি দ্বীপলক্ষ্মী, একটি নৃসিংহ ও একটি বৌদ্ধ নৈরাশ্র মূর্তি এবং পাকুড়তলা থেকে প্রাক বাংলা অক্ষরের কিছু সীলমোহর, পাথরের গণেশ ও বিষ্ণুমূর্তি এবং তামার প্রাচীন ঢালাই মুদ্রা।

দক্ষিণ-পশ্চিম সুন্দরবনের বিদ্যাধরী ও তার শাখা নদী গুলির তটভূমিতে একদা ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য জনপদ ও বর্ধিষ্ণু বন্দর গড়ে উঠেছিল। এখানকার বন্দর গুলির সাথে যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার প্রমাণ প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে পাওয়া গেছে। বিদ্যাধরী, পিয়ালী ও মাতলা নদীর তটভূমিতে আবিষ্কৃত প্রত্নস্থল চন্দ্রকেতুগড়, হাদিপুর, হাড়োয়া, খাসবালান্দা, ভাঙ্গর, ধুরা, ঢোসা, তিলপী প্রভৃতি। বিদ্যাধরী নদী তীরে গড়ে ওঠা চন্দ্রকেতুগড় খ্রীঃপূঃ চতুর্থ শতক থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত অর্থাৎ মৌর্য পূর্ব যুগ থেকে শুঙ্গ-কুশাণ-গুপ্ত-পাল ও সেন যুগ পর্যন্ত সমৃদ্ধ নগর ছিল। ১৯০৬ সালে লংহাস্ট সাহেব বেডাচাঁপা এসে সব কিছু পরিদর্শন করে এই সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেন-“ He mentions that he found Fair large size bricks 15 inch, long by 11 inch broad and moulded bricks and pottery assignable to an early period. The find of six rectangular copper cast coins in the neighbourhood.....Further shows that this was one of the earliest settlement in lower Bengal...Another site more promising for excavation as the fort is a mound known as Varahamihir’s house, just to the north-east of the Berachampa Railway Stations.(চন্দ্রকেতুগড়- দিলীপকুমার মৈত্রে, পৃষ্ঠা ৩৩)। ১৯৫৬ সাল থেকে কলিকাতার আশুতোষ সংগ্রহশালার পরিচালনায় এখানে খনন কার্য শুরু হয় এবং একের পর এক ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হয়। এখানে আবিষ্কৃত প্রত্ন সম্পদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য খনা মিহিরের টিবি ও সংলগ্ন বৃহৎ মন্দির। বৃহৎ চতুঃকোণ চার দিক জুড়ে ছিল বিশাল মণ্ডপ। মন্দিরের উপরিভাগ সুন্দর পালিশ করা ইট দ্বারা নির্মিত। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে মূল্যবান পাথর শোভিত পদ্মফুল নির্মিত। এখানে অবস্থিত অমৃতকুণ্ডের

জলাশয়ের নিকট রাশি চক্রের সকল রাশির চিহ্ন পাওয়া গেছে। তাই গবেষকদের স্থির বিশ্বাস খনা এখানেই তাঁর জ্যোতিষ চর্চা করেছিলেন। গবেষকরা বলেছেন মন্দিরটি গুপ্ত যুগে নির্মিত। এখানে বিভিন্ন ধরনের টেরাকোটা মৃৎ পাত্র, দেবদেবী, জীবজন্তু, ফলক, ছাঁচ ও সীলমোহর আবিষ্কৃত হয়েছে। ঝিকরাতে বৃষের পিঠে বসে থাকা উমা – মহেশ্বর মূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তিটিতে শিবের বাম হাতে আছে শিঙা, দক্ষিণ হস্তে ডমরু। এখান থেকে পাওয়া গেছে দক্ষিণ রায়ের মূর্তি। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে প্রাপ্ত মৃগ্ময়ী মাতৃ মূর্তিকে মাতৃ মূর্তির আদিরূপ বলেছেন। প্রচুর যক্ষ-যক্ষিণী ও অলংকার শোভিত কুবের মূর্তি, বিভিন্ন পশুপাখি এবং একমঞ্চ সুন্দরবনের পূজিত নানা দেব-দেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। বিভিন্ন ভঙ্গিমায় মৈথুনরত নরনারীর প্রচুর মূর্তি চন্দ্রকেতুগড়ে পাওয়া গেছে। এখানে মাটির বিভিন্ন সীল পাওয়া গেছে, যেখান থেকে জাহাজের নাম, বিদেশী রাজার নাম জানা গেছে। প্রাপ্ত সীল গুলির বেশীর ভাগ ব্রাহ্মী লিপির ব্যবহার, কয়েকটিতে খরোষ্ঠি লিপি ও ব্যবহৃত। পাথরের বোধিসত্ত্ব মূর্তি ও বৌদ্ধ ধর্মীয় বিভিন্ন প্রতীক, প্রচুর সংখ্যক পুঁথি, মাটির বাটখারা, কুশাণ যুগের স্বর্ণ মুদ্রা, মৌর্য ও গুপ্ত যুগের স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা পাওয়া গেছে। এখানে মাটির বড় বড় পাইপের মাধ্যমে জল নিষ্কাশন করা হত তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এখানে বেশ কয়েকটি লবণ গোলা, কাঁচা ও পাকা বাড়ী আবিষ্কৃত হয়েছে।

চন্দ্রকেতুগড় থেকে কিছু দূরে খাস বালান্দায় গুপ্তযুগের মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে, তুর্ক-আফগান যুগে যা মসজিদে রূপান্তরিত করা হয় এবং এখন লাল মসজিদ বলা হয়। নেপাল রাজ দরবারের একটি পুঁথিতে 'বালান্দা মহাবিহার'-এর উল্লেখ দেখে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিপির লেখাকে পালযুগের বলেছেন এবং তিনি বলেছেন পুঁথিটি

বালান্দায় রচিত এবং বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর শক্তি প্রজ্ঞাপারমিতার প্রতি উৎসর্গীকৃত। ভাঙ্গার-এ অপূর্ব শিল্প সুষমা যুক্ত পাল ভাস্কর্য শৈলীর একটি বিশালাকৃতির কণ্ঠি পাথরের বোধিসত্ত্ব মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। অনেকে মনে করেন মূর্তিটিই বালান্দা মহাবিহারের অধিষ্ঠাতৃ দেবী প্রজ্ঞাপারমিতার। পিয়ালী নদীর তীরে ধোসার চন্দ্রনেশ্বর গ্রামে সাহেব বাড়ী বা দমদমা নামে পরিচিত প্রাচীন রাজবাড়ী আবিষ্কৃত হয়। তিলপিতে আবিষ্কৃত হয়েছে বহু সংখ্যক টেরাকোটার মূর্তি পুতুল, ফলক, হস্তি দন্ত নির্মিত চিত্রফলক, অঙ্কন চিত্রযুক্ত প্রাচীন মুদ্রা, সীলমোহর ও নানা বর্ণের মৃতপাত্র। মূর্তির মধ্যে ছিল যক্ষিণী ও অম্বর, বুদ্ধ, বিচিত্র বসন ও শিরোভূষণ যুক্ত পুরুষ, বিশাল পাত্র বহন কারী পুরুষ এবং কিছু মিথুন মূর্তি প্রভৃতি। মৃতপাত্র গুলি নানাচিত্রপট ও জ্যামিতিক নক্সায় অলংকৃত। গবেষকদের মতে এখানে প্রাপ্ত সবই খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের সময়কালের।

মণিনদীর অববাহিকায় জলঘাটা, বাইশহাটা, বাড়িভাঙ্গা, রায়দিঘী, কঙ্কনদিঘী, জটা, মণিরতট, নলগোড়া প্রভৃতি স্থানে প্রত্নদ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে- নানারকম মৃতপাত্র, নানাবর্ণ ও আকারের পাথরের মাল্যদানা, নৌযানের ভগ্নাংশ, টেরাকোটা পুতুল, পাথরের গরুড়, বিষ্ণু, চতুর্মুখ লিঙ্গমূর্তি প্রভৃতি। বাইশহাটার মঠবাড়ী টিবিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খনন কার্যে আবিষ্কৃত হয়েছে নানা ধরনের বিষ্ণু মূর্তি, বুদ্ধের জীবন কাহিনী উৎকীর্ণ ক্ষুদ্রকার পাথরের স্তূপ, জৈনমূর্তি প্রভৃতি। বাড়িভাঙ্গা ও রায়দিঘীতে পাথরের একটি বিষ্ণু মূর্তি, একটি উমা – মহেশ্বর -এর আলিঙ্গনাবদ্ধ মূর্তি, একটি তারা ও চতুর্দিকে উপবিষ্টা দেবী মূর্তি, উৎকীর্ণ একটি বৃহদাকার লিঙ্গমূর্তি। কঙ্কন দিঘীতে অসংখ্য গড়ানো টিবি আছে, যার মধ্যে শ্বেত রাজার বাটি, পিলখানার

বাটি ও বুড়িমার বাটি ঢিবি গুলি উল্লেখযোগ্য। এখানে পাওয়া গেছে প্রস্তর নির্মিত নবগ্রহ ফলক, প্রাচীন লেখ উৎকীর্ণ সীলমোহর, নানাবর্ণ ও গড়নের মৃতভাণ্ড, বিষ্ণু, নানারকম মাতৃকা, বুদ্ধ, নরেশ্বর শিব, বটুকভৈরব, গণেশ সহ হর পার্বতী, মনসা ক্ষুদ্রকায় লোকেশ্বর প্রভৃতি মূর্তি। জটায় অবস্থিত নগর শৈলীর বিশাল শৈব দেউলটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে প্রাপ্ত তাম্রপট্ট লেখ থেকে জানা যায় অষ্টম শতকে প্রতিষ্ঠিত জটায় দেউল জয়ন্ত চন্দ্র নামে জনৈক নৃপতি নির্মান করেন। মণিরতট, ধবংসভাঙ্গা, ও নলগোড়া ছিল বিশাল প্রাচীর বেষ্টিত। এখানে বিষ্ণু, মহিষাসুরমর্দিনী, ব্রোঞ্জ নির্মিত চন্দ্রশেখর এবং কিছু জৈন ও বৌদ্ধ মূর্তি উদ্ধার হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে এখানে নগরায়নের উন্নত কারিগরী কৌশলের প্রয়োগের প্রমাণ মিলেছে।

সুন্দরবন এক অপার বিস্ময়, একদা যেখানে অরণ্যের গভীরতা সত্ত্বেও জনমানবের বসতি গড়ে উঠেছিল, ঠিক তেমনি এখন যেখানে গভীর অরণ্য, একদা সেখানে ও হয়তো বসতি গড়ে উঠবে। সুন্দরবনের লাঠ ও সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বুড়াবুড়ির তটে জি প্লটে একটি অপূর্ব মোচাকৃতি ফলকে নারীমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানের বেশ কয়েকটি ঢিবির নিকট আবিষ্কৃত হয়েছে শুষ্ক-কুষ্ণাণ যুগশৈলীর টেরাকোটা মূর্তিপুতুল, পাল ও সেন আমলের প্রস্তর ভাস্কর্য নিদর্শন, নানাবর্ণ ও আকৃতির মৃতপাত্র, মাল্যদানা, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ের স্বর্ণ মুদ্রা। জটায় পূর্ব দিকে নদীর বিপরীতে ১১৯ নম্বর লাটে দেল বাড়ির মন্দিরে নকসা যুক্ত ভাঙ্গা ইটের ছড়াছড়ি এবং মন্দিরের বর্গাকার আসন ও সরলদ্বার প্রবেশপথ। দক্ষিণে এইচ লাটে বনশ্যাম নগর, যেখানে প্রাচীন একরেখ দেউল দেখা যায়। এই নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে ১২ কিমি জুড়ে এফ প্লটে গোবিন্দপুর, এখানের ভাঙ্গা মন্দির থেকে প্রত্নদ্রব্য সন্ধানী

গবেষক কালিদাস দত্ত মহাশয় উদ্ধার করেন কালোপাথরের বৃষ পৃষ্ঠে নৃত্যরত নরমুণ্ড মালাধারী এক অভিনব এবং বিরল শিব নটরাজ মূর্তি। রাক্ষসখালীতে বড় বড় ঢিবি ও দালান বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ মিলেছে। আশুতোষ সংগ্রহশালার পুরাতাত্ত্বিকরা এখান থেকে বিদ্রোহী পাল রাজা ডোমনপালের তাম্রশাসন আবিষ্কার করেন। তাম্রশাসনটিতে ১১১৮ শকে বা ইংরেজী ১১৯৩ খ্রীঃ ভূদানের উল্লেখ আছে। ধূলিধসানির নদীর লাগোয়া দুর্গম বনভূমির অন্দরে হার্মাদ বরুজের এক ধ্বংসাবশেষ মিলেছে। মাতলার মোহনার পূর্বতটে নেতিধোপানি, তাকে ঘিরে চাঁদ সওদাগরের সপ্তডিঙ্গা ও বেহলার কলার ভেলার বিচিত্র কাহিনী সাহিত্য থেকে লোক কাহিনীতে বিদ্যমান। আবার উত্তর- দক্ষিণে সুন্দরবনের ৪ কিমি জঙ্গলের পরিসীমায় হাভাতি ডোমিখাল ও মাতলার সঙ্গমতট। সুরজমুক্তি ও লাখিখালের চারিপাশে মিলেছে ইটের বিশাল ইমারতের ভিত্তি, প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শনের মসৃণ ছাঁচে তৈরি ইট, বিচিত্র অলঙ্করণ যুক্ত রথ, যেগুলি বাংলার প্রাচীন বাস্তুকলার দক্ষতার প্রত্ন স্বাক্ষর। গোসাবা নদীর ওপারে চামটা বা চীমটা, গোনা বা চাঁদখালির কোর ফরেস্ট অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে তামার ঢলাই মুদ্রা, লাল কালো ও উজ্জ্বল কালোমাটির পাত্র, নানা পুঁতিদানা, টেরাকোটা ফলক, মূর্তি পুতুল, পাথর ও ধাতুর দেব দেবী মূর্তি ইত্যাদি। করঞ্জলি, কাঁঠাবেনিয়ায় আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন প্রস্তর মন্দিরের দ্বারবাজু ও বিশালাকার পাথরের জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি। এছাড়াও বিক্ষিপ্তভাবে সুন্দরবনের বিভিন্ন অংশে প্রাচীন স্থাপত্য লক্ষ্য করা গেছে। যদিও কোন ঐতিহাসিক গবেষণা বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সেই সব ক্ষেত্রে হয়নি, তাই এখনও আমরা আশা করতে পারি অদূর ভবিষ্যতে সুন্দরবন অঞ্চলের মানব সভ্যতা সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হবে।

উপসংহার(Conclusion)

ভারতীয় সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দীর্ঘদিন ধরে যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান পাওয়া গেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, এ অঞ্চলে মৌর্য পূর্ব যুগ থেকেই সমৃদ্ধ মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল এবং মৌর্য-শুঙ্গ-কুষাণ-গুপ্ত-পাল ও সেন যুগেও এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্থান পতনের মধ্য দিয়েই বর্তমান সুন্দরবন সংস্কৃতির সৃষ্টি। আমরা আশা করতে পারি আগামী দিনে প্রাচীন এই সভ্যতার আরো তথ্য সামনে আসবে। তবে এ বিষয়ে আশঙ্কার কথা হল, সুন্দরবনে যতটা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও আবিষ্কার হয়েছে, তা সবই প্রায় বিগত শতাব্দীর মধ্যবর্তী কয়েকটি দশকে। পরবর্তী কালে এবিষয়ে গবেষণা কমই হয়েছে। তবে ইতিমধ্যেই সুন্দরবনের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান নিয়ে সমৃদ্ধ তথ্য ভাণ্ডার বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে। যেমন- কলিকাতার পুরাতাত্ত্বিক পরিষদ, নয়া দিল্লির জাতীয় মিউজিয়াম, কলিকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালা, দক্ষিণ ২৪ পরগণার কৃষ্ণচন্দ্রপুর সংগ্রহশালা, কালিদাস দত্ত স্মৃতি সংগ্রহশালা, ডাঃ তুলসীচরণ ভট্টাচার্য সংগ্রহশালা, বালান্দা ও চন্দ্রকেতুগড় সরকারী সংগ্রহশালা এবং বিদেশে অ্যাসমলিন, ভিক্টোরিয়া, আলবার্ট, ও ব্রিটিশ মিউজিয়াম, আমেরিকা ও জার্মানীর কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা প্রভৃতি স্থানে। এই সংগ্রহশালা গুলির মাধ্যমে তরুণ শিক্ষার্থী ও গবেষকরা এবিষয়ে বিভিন্ন তথ্য জানতে পারছে এবং এবিষয়ে গবেষণার জন্য উৎসাহিত হচ্ছে। আরো আশার কথা যে বর্তমানে সুন্দরবন দ্বীপে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য বিষয়ক সচেতনতা খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে আমরা মাঝে মধ্যেই সংবাদমাধ্যমে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাপ্ত

প্রত্নদ্রব্য যথাযত স্থানে পৌঁছে দেওয়ার খবর দেখতে পাই। তাই সার্বিকভাবে আমরা আশা করতেই পারি আগামী দিনে সুন্দরবনের অনেক অপ্রকাশিত ইতিহাস আমাদের সামনে প্রকাশিত হবে।

তথ্যসূত্র(Reference)

শ্রীখণ্ড সুন্দরবন, সম্পাদনা- দেবপ্রসাদ জানা, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৪, পৃঃ ১৩-২৮, ৩৮-৫১ এবং ৫০৭-৫১২।

কোরক সাহিত্য পত্রিকা (সুন্দরবন সংখ্যা), সম্পাদক তাপস ভৌমিক, দেশবন্ধু নগর বাগুইয়াটি, ২০০০, পৃঃ ১৪৮-১৬০।

সুন্দরবনঃ মানুষ ও পরিবেশ- অশোক নাথ বসু, পৃঃ ৫-১৮।

বাঙালীর ইতিহাস-নীহার রঞ্জন রায়(প্রথম খণ্ড), তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা ১৯৮৫, পৃঃ ১৩৮-১৪৫।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার পুরা কথা- কৃষ্ণকালী মণ্ডল। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কলকাতা ২০০২, পৃঃ ১৩৩-১৩৫ এবং ১৪৬-১৫০।

চন্দ্রকেতুগড়-দিলীপ কুমার মৈতে, প্রকাশিকা-শিবানী মৈতে, দেবালয় বেড়াচাঁপা, পৃঃ ৩৬-৪১ এবং ৭৩-১৩০।

বালান্দা মহাবিহার ও চন্দ্রকেতুগড় – এম এ জব্বার, প্রকাশক-গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষদ, পৃঃ ৭৮-৮৫।

চব্বিশ পরগণাঃ উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন-কমল চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, পৃঃ ১৩১-১৫৫।

জটোর দেউল, লোককথা ও প্রত্নতত্ত্ব-
দেবীশঙ্কর মিদ্যা, পাবলিশার- প্যারালাল।

কথা সুন্দরবন, সম্পাদনা - দেবপ্রসাদ
জানা, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৮, পৃঃ ১৮-
৩২।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ইতিহাস-সুকুমার
সিং, প্রকাশক-মাস এন্টারটেনমেন্ট প্রাঃ লিঃ-
মহামায়াতলা, গড়িয়া ২০১০, পৃঃ ১২১-১৩০, ৭২০-
৭২৫ এবং ৮০২-৮১০।

দ্বীপের নাম সাতজেলিয়া, সম্পাদনা-
সন্তোষ বর্মণ, রূপকথা প্রকাশক, ২০১৩, পৃঃ
৯৫-১০৭।

স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন ও গোসাবা,
সম্পাদনা সন্তোষ বর্মণ, কথা প্রকাশন ২০১২, পৃঃ
১০৩-১১০।

Online Article- 'The journey of Kalidas
Datta and the Construction of Regional
History in Pre and Post Independent Bengal,
India-Bishnupriya Basak, 2011.

<https://www.researchgate.net/publication/272308436>.